একঅলৌকিক কিন্নর

সুধীরচক্রবর্তী

কৃষ্ণনগরের মতো জেলাশহর নানা দিক থেকে একটুঅন্যরকম। এখানে আছে একটা সমুন্নত ওসুবিস্তৃত রাজবাড়ি, যার
প্রবেশপথে আছে চারমুখো চক, তারপরে নহবৎ খানা, তারওপরেবিষ্ণুমহল এবং পঙ্কের আশ্চর্য কাকার্যখচিত বিশাল
পরিসরের এক হর্ম্য, যেখানে চৈত্র মাসে মেলা বসে বারোটি কৃষ্ণমূর্তিনিয়ে, নাম ঃ ‘ বারোদোল ’ আশ্বিনে পূজিত হয়
দুর্গামূর্তি ‘ রাজরাজেশ্বরী ’ এবং কার্তিকে জগদ্ধাত্রী। এই রাজবাড়ির সুশিক্ষিত দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্ররায় (যাঁর কাছে ম
াঝে মাঝে আসতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেমতো মানুষ)তাঁর ‘ ক্ষিতিশবংশ
াবলিচরিত ’ বইয়ে লিখে গেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী আর অন্নপূর্ণা পুজো প্রবর্তন করেছিলেন। হবেও ব
া, তবে এটাসত্যি যে কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী, কাব্যপ্রিয় এবং গীতরসিক ছিলেন । সেইজন্য তিনি সম্মান ও ক
াঞ্চনমূল্যদিয়ে ভারতচন্দ্র আররামপ্রসাদকে তাঁর দরবারে পরিপোষণ করতেন। তার মানে শেষআঠারো শতকের
দেশব্যাপী ডেকাডেন্সের দুটি উজ্জ্বল শস্য তিনি বপন করেছিলেন ---ভারতচন্দ্রের ‘ বিদ্যাসুন্দর ’ আররামপ্রসাদী গান।

কার্তিক দেওয়ান অবশ্য রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের আমলের নন, একটু পরবর্তীকালের ইনটেলেকচুয়াল। তাঁরছিল একটু ব্র
াহ্মঘেঁষা বোধবুদ্ধি এবং রাজবাড়ির খুব কাছে তখন ছিল একটিব্রাহ্মসমাজ। সেটি এখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ । কা
র্তিকেয়চন্দ্ররাগরাগিনীদক্ষ ওস্তাদ গায়ক ছিলেন, নিজের লেখার গানে সুর সংযোগকরে গাইতেন। তাঁর গানের সংকলন
গীতমঞ্জরীবেশ গুত্বপূর্ণ সংকলন, যার একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে আছে। এখানে বলা দরকার যে, কৃষ্ণনগরে
শুধু যে ওই রাজবাড়িআছে তাই নয়, তাঁদের বদান্যতায় পাওয়া জমিতে ১৮৪৬ সালে ইংরেজ রাজপুষরাএকটি সরকা
রি কলেজ শু করেছিলেন, যার ১৯৫৬ সালে নির্মিত গথিত ভাস্কর্যের থামঅলাস্থাপত্য এখনও শহরে এক প্রদর্শ বিষয়।
বয়সের বিচারে কৃষ্ণনগর কলেজ হল হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি) এবং হুগলী কলেজের সামান্য অনুজ । এই
তিনটিশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই দেড়শো বছর অতিক্রম করে গেছে, যেমনকলকাতার নারীশিক্ষর পীঠস্থান বেথুন কলেজ।

কৃষ্ণনগরের অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলে একদা পাঠনিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও প্রথম চৌধুরী। দ্বিজেন্দ্রলাল
ছিলেন দেওয়ানকার্তিকেয়চন্দ্রের সন্তান। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ এ পাশ করে তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সিকলেজে,
ইংরাজিতে। প্রথম চৌধুরী পাবনার হরিপুর থেকে পিতারকার্যব্যপদেশে এসেছিলেন তাঁর কৈশোরে এই কৃষ্ণনগরে। ‘ র
াণীকুঠি ’ নামের বাড়িতে থাকতেন। ‘ আত্মকথা ’ বইয়ে প্রথমচৌধুরী নিজেই কবুল করেছেন যে কৃষ্ণনগর আমার মুখে
ভাষা দিয়েছে। এখানে আসার আগে আমিছিলুম আধোআধোভাষী বাঙাল। এখান থেকেযখন চলে যাই তখন হই
স্পষ্টভাষীবাঙালি।

এসব কথায় সাবেককৃষ্ণনাগরিক (শব্দটি প্রথম চৌধুরী - কৃত) ব্যত্তিরাস্থানমাহাত্মে কিঞ্চি শ্লাঘা বোধ করেন। আমি ঠিক
কৃষ্ণনাগরিক নই,১৯৪২ সাল থেকে আছি। আমাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন দিগনগর, যা কৃষ্ণনগর থেকেদশ কিলোমিটার
দক্ষিণে। এই দিগনগর, যার মেয়েগুলি নাইতে নেমেচিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়ায়

অমরতা পেয়েগেছে। এখানে পাঠকদের বলে নেওয়া ভালো যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বড়মেয়ে সৌদামিনীরবিয়ে দিয়েছিলেন এই দিগনগরের সারদাপ্রসাদের সঙ্গে এবং অচিরে তাঁকেজোড়াসাঁকোয়নিয়ে যান। এটা ঘটনা যে রবীন্দ্রনাথ দিগনগরে এসেছিলেন এবংকৃষ্ণনগরেও এসেছিলেন প্রথমচৌধুরীদের রানীকুঠি-তে--- গানও গেয়েছিলেন। সারদা গাঙ্গুলি মশাই আমাদেরজ্ঞাতি । গ্রামসুবাদে তিনি একবারদিগনগরে এলে আমার পিতা তাঁকে মধ্যহভোজ করান। আমার মা শাকশুক্তোপঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে তাঁকে খাঁইয়েছিলেন একথা বাল্যে শুনে একটু আাদ হয়েছিল। এইকথা তুলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিচ্ছি, পাঠক,আপনাদের প্রশ্রয় চাই।

কিন্তু এসব রাগরাগিনীর আলাপসেরে এবারে ঢুকতে চাই ধরতাইয়ে। আমার বলার কথা হল, এক একটাজনপদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য থাকে। সামন্ততন্ত্রের বনেদ থাকার জন্যেই হোক,বা উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তির জন্যই হোক কৃষ্ণনগরের মানুষজন বরাবরইএকটু গড়পড়তা বুদ্ধিমান, রসিক, বাক্‌শিল্পী এবং জীবনের দিকে একটুতির্যকভাবে তাকাতে অভ্যস্ত। ভারতচন্দ্র - দ্বিজেন্দ্রলাল - প্রমথচৌধুরী---- এই ত্রয়ী লেখক সমকালের বিচারে সাহিত্যে একটু ভিন্ন স্বর বাস্রোতবিদ্ধতা দেখাতে পেরেছিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের বংশধারার আরএকটি শাখায় জন্মেছিলেন রামতনু লাহিড়ী এবং দেশকালের হালচাল অগ্রিমবুঝে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন ইংরাজিশিক্ষার দিশায়। ডি.এল. রায়ওচলে যান বিলাতে এবং এদেশে আমদানী করেন হাসির গান, যার সূত্র তিনি পান Ingoldsby Legends বই এবং স্কচ - আইরিশ - ইংরেজি সুরেরওঠানামার মজা থেকে। আমার বলার কথা এটাও যে, এ
ধরনের আলোকপ্রাপ্ত জনসমাজে ও শিল্পচর্চার পরিবেশে, ইচ্ছুকআর উৎসাহী নাগরিক খানিকটা স্বশিক্ষিত হয়ে যান স্বাভাবিকবাতাবরণের দৌলতে। কলকাতা থেকেমাত্র ১০০ কিলোমিটার দুরত্বের এই শহরতার অন্তঃস্তলে পেয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত খানিকটা ঔদার্য এবং চিমাননাগরসংস্কৃতির স্পর্শ।

এইবার আমি এসে পৌঁছলাম আসলজায়গায় এবং যার আলোচ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি,যাঁকেআমি চাক্ষুষ দেখেছি, কথাবার্তা বলেছি, তাঁর সঙ্গে আমার বেশঅন্তরঙ্গ বিনিময়ও নানাভাবে ঘটেছে।সাদা বাংলায় তাঁর ব্যক্তিপরিচয় হল তিনি একজন সংগীত তাত্ত্বিক, রাগদারীগানের জহুরী ও বাংলা গানের সমজদার - অথচ তাঁর জীবিকা ছিল হোমিওপ্যাথিডাক্তারি--- যে বিষয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ছিল পাকা কিন্তু প্রতিপত্তি ছিলনা--- তার জন্য কোনো খেদ বা হেলদোলওছিল না। ভদ্রলোকের নাম ছিল অমিয়নাথ সান্যাল (১৮৯৫ - ১৯৭৮)--- দ্বিজেন্দ্রলালও রামতনু লাহিড়ীরই বংশলতিকার তিনি উত্তরপুষ। তাঁর বাবা রায়বাহাদুর দীননাথ সান্যালের টীকাসমেত মধুসূদন রচনাবলি এক আশ্চর্য পাঠ্য, যদিও তিনি বৃত্তিতে ছিলেন সিভিল সার্জেন অর্থাৎ রাজকীয় চিকিৎসক ওবৃটিশ সরকারের বেতনভুক্ । কৃষ্ণনগর শহরের মাঝখানে দীননাথ এক বিস্তারিত তিনমহলা বাড়িগড়েছিলেন। আশ্চর্য যে তাঁর পুত্র অমিয়নাথ খোদ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারিপড়েছিলেন কিন্তু বিশ্বাস করতেন হোমিওপ্যাথিশস্ত্রে। ভারতের নাট্যশাস্ত্র নিজেনিজে পড়বেন বলে প্রবীণ বয়সে সংস্কৃতভাষা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করেনিয়েছিলেন। তাঁর পাড়ার নিকটাত্মীয় সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের(পেশায় বাস্তুবিদ্) কাছে শুনেছি কৃষ্ণনগরের বাড়িতে তাঁকে ডেকে অমিয়নাথ বুঝে নেন প্রাচীননাট্যগৃহ পরিকল্পনার মাপজোক--- যা নাকি নাট্যশাস্ত্রে নির্দেশিত আছে।এহেন তাত্ত্বিক ও সংগীতজ্ঞকে রবীন্দ্রনাথ একবার ডেকে নেন শান্তিনিকেতনে।বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজে অমিয়নাথের লেখা প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা একটা চটি বই কিন্তু মুক্তাগর্ভ শুক্তির মতো । কৃষ্ণনগরকলেজের শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থেঅধ্যাপকদের অনুরোধে তিনি একটি বড়প্রবন্ধ লেখেন শতবর্ষের বাংলাগানের দিগদর্শন নামে। তাতে তাঁর অনায়াস বাংলা গদ্য আর রসগ্রহিতারনমুনা পড়লে বোঝা কঠিন যে আগেকখনই তিনি লেখেন নি। একটি নমুনা দেখাই ঃ
আমার বাল্য ও যুবাবয়সে অর্থাৎ ইংরাজি বিংশ শতাব্দীরপ্রথম অংশে হিন্দী কালোয়াতী গানের সমজদার ওসমালোচকদের মুখে শুনে এসছিবাঙ্গালীর গলা মিষ্টি বটে এবং সুরআছে , কিন্তু বাংলায় , কিনা বাংলাভাষায়, ভাল গান হয়না --- বাঙ্গলী গান বাজনায়পটু নয়। রাগরাগিনীর ইন্দ্রধনু বোম্বাই, গোয়লিয়র,রায়পুর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌনগরীর বিলাসবিহ্বল সৌধশ্রেণীর উপর দিয়ে বেঁকে এসে বারানসীরভালকামন্ডির পাশ দিয়ে অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে অন্তর্হিত

হয়েছে।বিষ্ণুপুরের আকাশে কিছুদিনের জন্য একটা ছোটোখাটো ইন্দ্রধনুরআবির্ভাব হয়েছিল এরূপ ব্যঙ্গপ্রশস্তিও তাঁদের মুখে শুনতে পেতাম।

বাংলা গানের লোকায়তআঙ্গিকগুলি সম্পর্কে তাঁর উন্নাসিকভাব ছিল না। রাগদারী মানুষদের সঙ্গেদীর্ঘদিন সাথসঙ্গত করেছিলেন --- মৌজুদ্দিন, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গণপৎরাওভাইয়া, গহরজান, মালকাজানদের কাছে ১০১হ্যারিসন রোডে কত সায়ংসন্ধ্যা গানশুনেছেন, তবু বলতে ভোলেননি যে,

সেকাল ও একালের শিল্পীরতুলনা করা উচিত বা সম্ভব কিনা এ সকল কথা বাদ দিয়েও একটা কথা মনেথাকে। সেকালে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর বা বাহাদুরি ছিল না--- উপায়ও ছিল না।সোনার জলে রঙ্ করা রাজসংস্করণের প্রকাশ মাহাত্ম্য ছিল না। সংবাদপত্রেরবিজ্ঞাপনের কারিগরিও ছিল না ।এরূপ অবস্থায় যখনভাবি গোবিন্দ অধিকারীর নিজ মুখের গান শুনবার বাদূতীর ভুমিকা উপভোগ করবার জন্য বিশ - ত্রিশ মাইল দূরথেকে জনসাধারণপায়ে হেটে এসেছে এবং গান শুনে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে কৃতার্থ মনে করেনিজের গায়ে ওড়না বা অলঙ্কার শিল্পীদের দান করে গিয়েছে তখন মনে মনেচমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না।

এমন সংবেদনশীল মনের মানুষটিশান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রসান্নিধ্যেও টিকতে পারেননি। কেন তিনি চলে আসেন জানি না তবে তাঁকেনিয়ে একটা মজার গল্প শুনেছি।আসলে তখন তাঁর প্রথম যৌবন এবং সদ্য বিয়ে হয়েছে । তাইশান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিকতার চেয়ে স্ত্রীর সম্পর্কে বিরহ ছিলপ্রবলতর। অন্যান্য আশ্রমিকরা যখন শান্তিনিকেতনেই পড়ে থাকতেন, এমনকিছুটির দিনেও ---তখন অমিয়নাথ ছুটি পেলেই আসতেন কৃষ্ণনগরে । রবীন্দ্রনাথসে খবর রাখতেন এবং তাঁর মনের কথা ছিল এটাই যে, সকলে এই আশ্রমিকপরিবেশেই থাকুক। কিন্তু অদম্য অমিয়নাথকে ঠেকাতে পারলেন না। শোনা যায়, তিনিঅমিয়নাথের মমেটকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হ্যাঁগো, তুমি তো অমিনয়নাথেরবিয়েতে গিয়েছিলে, তার বউ কি খুব সুন্দরী ? মানে, আমার চেয়েও তারআকর্ষণ বেশি ?

বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে এইএক মজা, সত্যি মিথ্যে নানা গল্প তাঁদের নামে রটে যায়। অমিয়নাথকে আমিসামনাসমানি প্রত্যক্ষ দেখেছি সুধু নয়--- আড্ডাও মেরেছি। তখন তিনি বেশবয়স্ক আর আমি কৃষ্ণনগর কলেজের তণ অধ্যাপক। ভদ্রলোক ছিলেন, যাকেবলে মেজাজি। ক্ষণে ষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। আমরা যখন কলেজে উঁচু ক্লাসে পড়তাম, তখন ভয়েভয়ে, সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতাম মস্তসব নামকরা বিদ্বান ব্যত্তিদের আসা যাওয়া ছিল তাঁর বাড়িতে। শহরে কোনোগুণী বা কলাবত্ত এলেই একবার টুঁ মারতেন পাঁচুবাবু ওরফে অমিয়নাথেরবৈঠকখানায়। কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড বা হাইস্ট্রিটনামে একটা চওড়া রাস্তা আছে---- সেখানেই ছিল তাঁর বাড়ি। বাইরেরঘরে বসে থাকতেন আর নস্যি নিতেন মাঝে মাঝে। মুড অনুযারী বেশ কমাস হয়তেদাড়ি রাখলেন আবার হঠাৎই কামিয়ে ফেললেন। ।এমন মজার মানুষটার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করত কিন্তু সাহস হত না ।উপরন্ত দেখলাম আমাদের কলেজের নাম করা গম্ভীরদর্শন অধ্যাপকরা তাঁর ঘরেবসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তাঁদের কাছেজিগ্যেস করলে জানা যেত--- অমিয়নাথ বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন আলাপআলোচনায় ঠিকরে উঠতো জ্ঞানের দীপ্তি। গান গাইতেন চমৎকার, তবে কন্ঠটিছিল একটু কর্কশ। কিন্তু সুরের বোধ ছিল পাকা। খেয়াল ও ঠুংরির নানা লজ্জাৎ তাঁর জানা ছিল । নিজে চমৎকার এসরাজ বাজাতেন। একবার কলেজেরএক অনুষ্ঠানে নেমতন্ন করবারছুতোয় বিকালে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। প্রশান্ত মনে দুচার কথা বললেন। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের প্রবলগরমে এত কষ্ট হতে লাগল যে তাঁর কথাবার্তা ভালো করে শুনতে ইচ্ছেকরল না। বললাম এ ঘরে এত গরম কেন ?

----গরমতো হবেই। পশ্চিমমুখো ঘর তো !

----একটাপাখা লাগাননি কেন ?

----সেটারএকটা গূঢ় কারণ আছে। পাখা থাকলে দেখেছি কেউ আর উঠতে চায় নাবসেই থাকে। আমার তো

কাজ আছে নাকি ?
ভারি মজার মানুষ যে সেটা টের পেলাম। তখন তিনি ‘ দেশ ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন স্মৃতির অতলে নামে এক অত্যাশর্চ্যসংগীতস্মৃতি, আর আমরা গিলছি। লেখাগুলি সান্ধ্য আড্ডায় তিনি পড়েশোনাতেন খসড়া আকারে। যেমন তার ভাষা, তেমনি তার বর্ণনা । সেইসঙ্গেকৃষ্ণনগরের নিজস্ব রসবোধ।বাংলার সংগীতজ্ঞদের মধ্যে দুই দিকপালধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপ্যাধ্যায় আর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁরঘনিষ্ঠতা ছিল। ধূর্জটি ছিলেন তাঁর এক বছরের অগ্রজ আর দিলীপকুমার ছিলেন এক বছরের অনুজ।তাঁর গানের দীক্ষা ঘটেছিল খলিফাবদল খাঁ আর শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছে। ১৯১২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত একটানা ওঠাবসা করেছিলেনভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়মাপের ওস্তাদ গাইয়েদের সঙ্গে। বাবা কাকারকাছে শেখেন বহুরকমের বাংলা গান, বিশেষ পাঁচালি ও টপ্পা গান। নানাধরনের গান শোনা আর শেখার আগ্রহেতিনি যৌবনে যেতেন চন্দননগরে,গোঁদলপাড়ার রামবাবু রানাঘাটের নগেন ভট্টাচার্য, উত্তর কলকাতারসতীশমুখুজ্যে, ভবানীপুরের নগেন্দ্রবাবু আর হাওড়ার কালীপদ পাঠকের কাছে। মন দিয়ে শুনেছেন ফিকির চাঁদের গান, সেকালের যাত্রাথিয়েটারের গান, নানা ধাঁচের বাংলা টপখেয়াল। মাঝে মাঝে দেখতাম তাঁরবাড়ির কাছে প্রীতি কেবিনের সামনে রাস্তায় বেঞ্চিতে বসে চা পানকরছেন আর বাউলদের গান শুনে বলছেন ‘ বলিহারি ‘ বলিহারি ’ ।

এবারে একটা বৃত্তান্ত বলি।তখন কৃষ্ণনগর কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। কলেজে রবীন্দ্রসংগীতপ্রতিযোগীতায় তিনি গিয়েছিলেন বিচারক হয়ে। বিচারে যাঁকে প্রথম করলেন তার গানআমার মনঃপুত হয়নি। বিকেলের দিকেসাহস করে অমিয়নাথের বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতিবাদী ভঙ্গীতে জনালামআমার অসন্তোষ। শান্তভাবে হাসিমুখে সব শুনে বললেন ঃ আপত্তিটাকোথায় ?

----সুরভুল ছিল!

---কীকরে বুঝলেন ?

আপনি বলায় অস্বস্তি ছিল। সেকথা বললাম, শুনলেন না।তখন বললাম, সুর ভুল ছিল মানে স্বরবিতানের সঙ্গে মেলেনি। এবার মোক্ষম প্রশ্ন ঃ স্বরবিতানের সুর যেঠিক কে বলল ? গানটা জানেন ? কন তো শুনি স্বরবিতান কি বলছে।
কম বয়সে লজ্জা ও কান্ডজ্ঞান দুই কমথাকে তাই গেয়ে দিলাম ঃ আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা ! চোখ বুঁজে শুনে বললেন, সাধু সাধু ----এ বারে আমি গাই ?তুলে নিলেন এসরাজ। তারপরে তার সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে গানটা গাইলেন

সুর যেন চুঁইয়ে পড়ছিল, যদিওতাঁকে সুকন্ঠ বলা যাবে না কিন্তু কি অসামান্য লয়ের কাজ এবং মীড়ের স্পর্শ ।বললেন, গানটা তো খোদ রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি কিনা ---- দিনুবাবুস্বরলিপিতে বেশ পাল্টে দিয়েছেনতাই না?এখন তাহলে আসল কথাটা জিগ্যেস করি? যে মেয়েটা ফাস্ট হল তারকন্ঠ তো সুমিষ্ট ? তাল আর লয়ে ঠিক ছিল স্বচ্ছন্দে গেয়েছে । শুনতে ভালো লেগেছে । ব্যাস্ মিটে গেলে --- ফাস্ট ।

এসব কথার তাৎপর্য তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছি। যখনস্মৃতির অতলে পড়ে ভাবুক রসগ্রাহী অমিয়নাথকে খানিকটা বোঝার বয়সহয়েছে। তাঁর লেখা পড়ে জেনেছি গাইয়ে লোকের চোখের মধ্যে নাকি সুরেরএক অগ্নিকোণ আছে। বলতে চেয়েছেন ঃ অনুভবের ইন্দ্রধনু উদিত হয়জ্ঞানসূর্যের বিপরীতদিকে। কবুল করেছেন ঃ
শ্যামলালজী আর বদল খাঁ সাহেবআমাকে বেঁধে ফেলেছিলেন। কেউ কি কখনও ভাবতে পারে যে, কলিকাতায়অবস্থানকারী আমার মতো একটিতাজা চোখ কান খোলা তণ যুবক গড়ের মাঠের খেলার কথা জানেনি, চলচিচত্রেরআকর্ষণকে তুচ্ছ মনে করেছে, সমবয়স্কদের সঙ্গ ছেড়ে চুরাশি আর চুয়ান্নবৎসরের প্রৌঢ়ের সঙ্গ বেশি লোভনীয় মনে করেছে ?
গানপাগল এমন মানুষ কোনো চাকরিও করেননি। কিন্তুকৃষ্ণনগরের বেশিরভাগ মানুষইজানতে পারেনি তাঁকে । তিনি যে সংগীত ক্ষেত্রে একজন মস্ত সমঝদারএবং ওস্তাদমহলে বহুলভাবে স্বীকৃত তা কিন্তু তাঁর জীবিতকালে শহরবাসীবুঝতে পারেনি। বুঝতে তো পারেই নি, উপরন্তু তাঁকে একজন খ্যাপাটেমানুষ বলেই মনে করত। একই সঙ্গে অসফল হোমিওপ্যাথ এবং উচচাঙ্গসংগীতেরপারদর্শীকে কে আর তেমন মর্যাদা দেয় ? ৮৩ বছর বয়সেযখন তিনি নিজের শহরেইপ্রয়াত হন

তখন জন পনের - কুড়ি শহরবাসী তাঁর শবানুগমন করেন এবংএকজনের বৈঠকখানায় ছোট একটা শোকসভা হয়, যাতে সাকুল্যে তিরিশজনও ছিলেন না। সেই শোকসভায় এক সরলস্বভাবের কৃষ্ণনাগরিক বিনম্রভঙ্গিতে বলেছিলেন তাঁর ভাষণেঃ অমিয়সান্যাল মশাই সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা--- শুনেছি তিনিগানটান নিয়েচিন্তাচর্চা করতেন। তিনি যে একজন নামকরা লোক সেটা টের পেতামকলকাতা গেলে। বহু বিখ্যাত মানুষ লেখক বা সাংবাদিক যখন জানতে পারতেন আমিকৃষ্ণনগর থেকে আসছি তখন সর্বদাই জানতে চাইতেন--- অমিয়বাবু কেমন আছেন ?

অমিয় সান্যালের পাড়ায় যাঁরাথাকতেন তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে কবুল করেন যে, ছোকরা বয়সে আমরালোকটিকে খুব জ্বালিয়েছি । তিনি যখন বাইরের ঘরে বসে পড়াশোনা বাগানচর্চা করতেন তখন আমাদের মধ্যে কেউএকজন বারান্দায় উঠে ঘরের কড়া খুব জোরে নেড়ে বলে উঠত ---এই বেলেডোনা - ঠুংরি !

বেলেডোনা - ঠুংরি অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি আর গানের মিশ্রণ নিয়ে তুচ্ছার্থে এমন নিচুশ্রেণীরঠাট্টা তাঁকে সইতে হয়েছে। শহরবাসী জানতে পারেনি যে তখন সমকালীন নামের কলকাতার মাসিক পত্রেতিনি ধারাবাহিকভাবে ভরতের নাট্যশাস্ত্র--এর মতো কঠিন বইয়ের ভাষ্য রচনা করে চলেছেন। তাঁরা এ কথাওজানতেন না যে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ অর্থাৎ দীর্ঘ দশ বছর কলকাতার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তিনি সপ্তাহে দুদিন অধ্যাপনাকরতেন। এই জীবপর্বেই তিনি 'Ragasand Raginis' নামের পান্ডুলিপিরচনা করেন, যার এক সংক্ষেপিত অংশ বই হয়ে বেরোয় ওরিয়েন্ট লংম্যান্স্ থেকে। সাংগীতিকদৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাগবিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপে এ বইতে তাঁরনির্ণয় অত্যন্ত মৌলিক । সেকথা একটি লেখায় জানিয়েছেন পূর্ণিমা সিংহ।তাঁর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ১৯৬২ সালেমার্কিন দেশে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েভারতীয় রাগরাগিনী বিষয়ে একটানা বেশ কটি ভাষণে তিনি অমিয়নাথেরনির্দেশিত পদ্ধতি মেনে উপকৃত হয়েছিলেন। অমিয়নাথ সান্যাল ঃসংগীততত্ত্বের যুগান্তকারী পথ প্রদর্শক নিবন্ধে পূর্ণিমা সিংহ জানিয়েছেন অমিয়নাথেরপরিকল্পিত রাগ নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রাবণী চক্রবর্তী নামেএকজিজ্ঞাসু গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছেনও ডক্টরেট পেয়েছেন। কিন্তু 'Ragasand Raginis' পান্ডুলিপি সম্পূর্ণত ছাপা হয়নি বলে অমিয়নাথের ক্ষোভ ছিল । 'Music of Alapa' নামে তাঁর আর এক পান্ডুলিপি ছাপা হতে হতে অর্ধপথে কেন যে থেমে যায় জানা যায় না।বইটির এখন আর হদিশ নেই। 'Ragas and Raginis' বইটিরও পরেকোনো সংস্করণ হয়নি অথচ চাহিদা ছিল। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথাথেকে জানা যায় 'Ragas and Raginis' বইটি অমিয়নাথ উপহার দিয়েছিলেন রবিশঙ্কর ওরাধিকামোহন মৈত্রকে। দুজনই তাঁকে মৌখিক আশ্বাস দেন ও প্রশংসা করেনকিন্তু পরে উদাসীন হয়ে যান। সেই দুঃখে ১৯৬৮ সালে চিরতরে তিনিকৃষ্ণনগরে ফিরে আসেন ।এর দশ বছর পরে তাঁর জীবনাবসান হয় কিন্তু তার আগে সব পন্ডুলিপি নিজেরহাতে ছিঁড়ে ফেলেন । কনিষ্ঠা কন্যাকে বলেনঃ এসব তো পশুশ্রম করেছি,কেউ জানতেও চায় না, দিলেও নেয় না--- হয়তো অন্তরালে উপহাসকরে।

এই পর্যন্ত পড়ে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে অমিয়নাথ নিতান্ত ভাগ্যহত ব্যক্তি। তাঁর স্বাতন্ত্র্যও চিবোধ সম্পর্কে অনেকেই শ্রদ্ধাবানছিলেন । তিনি গুণজ্ঞ ছিলেন তাই গুণীরা তাঁকে সন্মান সমাদরকরতেন। সেই বৃত্তান্তে যাবার আগে পাঠকদের জেনে রাখা ভালো যে, তাঁর বড় মেয়ে রেবামুহুরি একজন প্রতিষ্ঠিত ঠুংরিশিল্পী, যাঁকে দিয়ে ফিল্মেগান গাইয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। অন্য দুই মেয়ে বৈজু ও মঞ্জু বাবার কাছে সতর্কতালিম পেয়ে চমৎকার গাইতেন, তবে প্রকাশ্য আসরে নয়। অমিয়নাথেরছোটছেলে সচ্চিদানন্দ সান্যাল, যাঁকে আমরা শহরসুবাদে ' লোটনদা ' বলতাম, অনায়াসে সবরকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন। তাঁর কাছে আমি দুচারখানাগান শিখেছিলাম। লোটনদা বলেছিলেন, বাবা আমাকে সবরকম যন্ত্রে তালিম দিয়েও সাবধান করে বলেছিলেন কখনও আসরে নাবাজাতে। একমাত্র গিটার যন্ত্রটি আমি নিজে নিজে শিখেছি তাই ওটা প্রকাশ্যেবাজাই।

এই লোটনদার মুখে আমি তাঁরবাবার সম্পর্কে একটি আশর্চ্য কাহিনীশুনি, তখন অমিয়নাথ প্রয়াত। লোটনদা ছিলেন বিজ্ঞানের স্নাতক এবং সারা চাকরি জীবনটাই কাটিয়েছেনপ্রবাসে (এখন থেকে বর্তমানে)। একদা তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওসহকর্মীর কাছে তিনি জানতে পারেন তার আপন পিসির নাম হীরাবাই বরোদেকার। শুনেই লোটনদার মননেচে উঠল। তাঁর মনে হীরাবাইয়ের খেয়াল পরিবেশনে এমন অপরূপলয়কারীর কাজ থাকে যার সঙ্গে তবলায় ঠেক দিতে স াধ যায়। অচিরে বন্ধুকেতাঁর মনের বাসনা জানাতে বন্ধু বললেন, ঠিক আছে। চলো একদিন পুণায়। পিসিওখানেই থ াকেন। চিঠি লিখে একমাস পরে নির্দিষ্ট দিনে দুইবন্ধু রওনা দিলেনবোম্বে থেকে। এবার শোনা যাক লোটনদার জবানিতে।

লোটনদা বললেন, ইতিমধ্যে বাবাকেকেষ্টনগরে জানিয়েছি য়ে হীরাবাইয়ের গান শুনতে যাচ্ছি--- আসল ইচ্ছাযেতাঁর লয়কারী গানে ঠেকা দেবার,সেটা চেপে গিয়ে চিঠিতে জানতে চাইলাম শিল্পীর জন্য কী ধরনের উপাহার নিয়ে যাওয়া উচিত।

বাবাজানালেন, উঁচু খানদানের বনেদী কিন্নরী এই হীরাবাই। পুণা শহরে যে ফুলেরবাজার আছে সেখানে থেকে কিনবেসবচেয়ে দামী ১০০ গোলাপের একটা তোড়া, সেইসঙ্গে খুব দামী একভরি আতর।তাঁর মুখোমুখি হওয়া ম াত্র ফুল আর আতর পায়ের কাছে রেখে দুপা পিছিয়েএসে বেশ ক ’বারসালাম দেবে। ব্যাস্ তারপরে দেখবে কী কান্ড ঘটে।

বেশ উত্তেজনা নিয়ে পুণায় গেলামবুঝেছো, লোটনদা বললেন, মার্কেট থেকে ফুল - আতর কিনতে দেখেবন্ধু বলল,ওসব আবার কেন? আমি রহস্যের হাসি হাসলাম। তারপরে পৌঁছলাম বন্ধুর পিসি হীরাবাই বরোদেকার নামেরভারতবিখ্য াত শিল্পীর বাড়ি। এঁরাতো ঠিক গায়িকামাত্র ছিলেন না। বাবা যাকে বলতেন কন্ঠবাদন, কন্ঠটাই তাঁদেরযেন বাদ্যের মতে া ছিল। যাহোক, বসলাম ভিতরের সুসজ্জিত ঘরে। শান্ত,ঠান্ডা, সুচিসম্পন্ন সাজানো ঘরে। একটি সরস্বতীর সাদা প াথরের মূর্তি ।দামী গালিচা পাতা আর আভিজাতএকসেট সোফা । তাতে বসে বন্ধু অন্দরে গেল পিসিকে খবর দিতে। যেন খানিকটাঘোরের মতো লাগছিল ---- আবিষ্টভাব। সহসা পর্দা সরিয়ে তিনি ঢুকলেন।সহাস্যমুখ ভারি প্রসন্নতায় ভরা। বললেন, আও বেটা। সত্যি বলতে তাঁরসাজপোষাকের দিকে তেমন তাকাইনি।বিহ্বলভাব এসে গিয়েছিল। ততদিনে হীরাবাই তো পঞ্চাশ পেরিয়েছেন নিশ্চয়ই---মনে হল শান্ত সৌন্দর্যের কী স্নিগ্ধতা!
নিমেষে আচ্ছন্নভাব কাটিয়েউঠে দাঁড়ালাম। তারপর বাবার চিঠির নির্দেশ মতো ফুলের তোড়া আরআতর পায়ের ক াছে রেখে দুপা পেছিয়ে সালাম দিলাম বারবার।
চমকে গিয়ে হীরাবাইবিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্থির হয়ে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন,তুমি কে বেটা ? এমন কদরদানি তো গত দশপনেরো বছরে আর দেখিনি এসবরেওয়াজ এখন আর দেখিনা । নিশ্চয়ইতোমার খুব উঁচু খানদান। তোম ার নাম তো শুনলাম সচ্চিদানন্দ । টাইটেল ?
----সান্যাল । সচ্চিদানন্দ সান্যাল।আমি বাঙালি।
----সে তো চেহারাতেই মালুম।কিন্তু বাবার নাম কী ?
----অমিয়নাথ সান্যাল।
খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে ‘ সানিয়াল ’ ‘ সানিয়াল ’ বলে হঠাৎ যেন কী একটা মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে জিগ্যেস কললেন, পাঁচুবাবু কি?
----হ্যাঁ।
তখন যদি দেখতে সালামের ঘটা,মানে অদৃশ্য আমার বাবার উদ্দেশে । কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বারবার বলতে লাগলেন,মস্ত দিলদার আদমি এই পাঁচুবাবু। বদল খাঁর মুরিদ। আরে বাপ, তুমিতার বেটা ? তিনি কেমন আছেন ? তাঁকে আমার হাজ ার সালাম জানাবে।
এরপরের ঘটনা অনুমান করতেপারো। খাওয়া দওয়া - এলাহি কান্ড। সে কি খাতির ! সেদিন সন্ধেবেলায় ইমনের ওপর দেড়ঘন্টাধরে যা গাইলেন আর আমি যে কী আরামে বাজালাম, এই দ্যাখো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

অমিয়নাথ সান্যালের সম্পর্কে এমনএকটা কাহিনী শুনে মনে হল তাঁর যথার্থমরমি মূল্যায়ন হতে পারতে বৃহত্তর শিল্পী মহলে। হয়নি, তার কারন কৃষ্ণনগরে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন ।এও তো সত্যি যে মানুষটি ছিলেন স্ববিরোধের প্রতীক। যেমন, আমরাতাঁর শহরবাসীরা আশ্চর্য হতাম দেখে যে তাঁর মেজ ছোট মেয়ে বৈজয়ন্তীআর জয়জয়ন্তীকে তিনি স্কুল কলেজে পড়তে দেননি। এমনিতেও বোঝারউপায় ছিল না তাঁর মনমেজাজ কখনকেমনথাকে। আমি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করি তখন সেই ষাটেরদশকে ভয়ভীতি কাটিয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারতাম তাঁর সেই বিখ্যাত বৈঠকখানায় ।হয়তনিতান্তই বসেই আছেন কিংবাটেবিলে টোকা মেরে গুনগুন করে চলেছেন কোনো প্রসিদ্ধ ঠুংরিরসুর। পরনে সর্বদাই থাকত ধুতি আর গেঞ্জি, হাতে নস্যির টিপ। ঘরে ঢুকে একটুসময় অপেক্ষা করতাম, কারণসমাদর বা অনাদর যে কোনো একটা কপালে জুটতে পারত। যেমন দেখেই হয়তপ্রসন্নমুখে উজিয়ে উঠে বলতেন, আরো আসুন আসুন--- বসুন। কিংবা একেবারে দু ’হাতজুড়ে নমস্কার করে বলতেন এখনব্যস্ত আছি মাপকোরবেন ।ভুলে যান কেন যে আমি একজন ডাক্তার, আমারতো জি রোজগারের চিন্তা করতে হয়। গিটুগি আসবে, এখন কি গানফাননিয়ে কথা বলা সম্ভব ?

সমাদর বা অনাদর দুটোব্যাপারই মেনে নিলে অসুবিধা হত না। আমি কখনও কিছু মনে করিনি। সম্ভ্রম হত,ভাবতাম আমার বিবেচনায় এই ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় লেখা দশটি সেরা বইয়েরএকটির লেখক। বইটির নাম স্মৃতিরঅতলে ।যারা তুল্য সংগীত -সাহিত্য এ দেশে নেই। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ওকুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরঅতলে -র ধাঁচে অনেক পরে বই লিখেছেন ঠিকই, তবে তাতে অমিয়নাথেরমতো অত গভীর পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনাসৌকর্য নেই। ধূর্জটিপ্রসাদ তার এক লেখায় অমিয়নাথের স্মৃতিরঅতলে প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ঃ তিনি সংগীতের মতন কলার,যার স্মৃতি রেকর্ড ভিন্ন ধরে রাখা যায় না, সেই কলার একটি সুন্দরআবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন।... যে ব্যক্তি, যে-রচনা আমাকে স্ট্যান্ডার্ডস্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারি না।অমিয়নাথ ভারতের সেরা কলাবন্তদের সান্নিধ্যে বহুদিন কাটিয়ে এবং হিন্দুস্থানীরাগসংগীতের শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি সবচেয়ে পারঙ্গম শিল্পীদের কণ্ঠেবারবার শুনে যে উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তাকেই বলা চলে চরম সংগীতেরগভীরতা। তাঁর অনুভবকে বোঝাতে তিনি যে ভাষা ও বর্ননার আশ্রয়নিয়েছিলেন কোনো সংগীতরসবেত্তা সেই স্তরে আজও পৌঁছতে পারেননি।একটি শুধু নমুনা দেব স্মৃতির অতলে থেকে। লিখছেন কালে খাঁ -র একটিগানের ব্যাখ্যানেঃ

শব্দগুলি কখন সূক্ষ্ম গমকেরনিস্বনে কেঁপে ওঠে, কখনও বা জমজমার মাদকতায় হেলতে দুলতে সপ্তকের এদিক-ওদিক যেখানে সেখানে নৃত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। শীতেরঅন্তেবসন্তের আমেজে পত্র -পল্লবের মত যেন কথার টুকরোগুলিঝকঝক করে ওঠে। বসন্ত আর যৌবন সমাগম একসঙ্গে। এদের আভাস ইঙ্গিতেরাগলতিকার বৃন্তে দেখা যায় গিটকারির গুচ্ছ, আধফুটন্তফুলের স্তবকের মত। ললিতাপঞ্চম রাগিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তো দেখিবসন্তের চমক। সুরশ্রুতির শিহরণ তো যেন গানের শরীরের যৌবনেরইজাগরণ। একি বাস্তবিকই ললিতাপঞ্চমে উন্মত্ত যৌবন বিভ্রম ? নাকিগুণীর হৃদয়ে প্রতিভার উন্মাদনার চরম এক মূর্তি।

সংগীতের নন্দনবনে এই অলৌকিককিন্নরের পদপাত বাংলা ভাষাকেই যেন উন্নত করেছে। কিন্তু শুধু এমনভাববিহ্বলতাই নয়, তাঁর মধ্যে ছিল অসামান্য রসবোধ এবং বাস্তব কান্ডজ্ঞান ।এ ব্যাপারে তাঁর দুটি মন্তব্য উল্লেখ করব যার একটির আমি প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও শ্রোতা,আর একটি অন্যের কাছে শোনা!

আগেরটা আগে বলি। কলেজেদর্শনবিভাগের সহকর্মী অধ্যাপক অনিলমুখার্জিকে একবার অমিয়নাথের কাছেনিয়ে গিয়েছিলাম। বলা উচিত ডাক্তার অমিয়নাথের কাছে। অনিলবাবু ক্রনিকডিসপেপসিয়ায় ভুগছিলেন। তাঁরইনির্বন্ধে যাওয়া। অমিয়নাথ খুব খুশি --- এতদিনে মশাই তবু একটা গী ধরেএনেছেন। বেশ বেশ। তাত্ত্বিক মানুষ তো, শুধু সুরের বা স্বরের নয়, হোমিওপ্যাথিও তাঁর বিবেচনায় একটাতত্ত্ব । যাইহোক, অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন কিন্তু বেশি প্রশ্ন করলেন না। পরে বললেন, খাদ্যসম্পর্কে লোভ থেকেই আপনার এই রোগ। ওষুধ দিচ্ছি, তবেনিরাময় হবে না। দমন করে রাখবে ।বয়েস পঞ্চাশ বললেন তো ? বাকি জীবনটা তেল মশলা দেওয়া খাদ্য ত্যাগকরতেই হবে। উদরবিভাগে স্থায়ী প্রদাহ আছে। সেদ্ধসাদ্ধা খেতে হবে---- মনে একেবারে যাকে বলে সিদ্ধপুষ,বুঝলেন ? তবে হ্যাঁ, হঠাৎ হয়তোএকটা

বৃহৎ ভোজের নেমন্তন্ন এলো,বিয়ে বা পৈতের, দ্বিধা করবেন না, খেয়ে নেবেন পেটপুরে। এতো আর রোজরোজ হচ্ছে না। না খেলে দেহ কষ্ট পাবে, আপনি দর্শন বিদ্যা পড়ান---আপনাকে কি বোঝাতে হবে যে দেহই আত্মা ?

দ্বিতীয় কাহিনীটি শোনা। একজনগী এসে তঁকে শরীরের নানা সংকট সমস্যার কথা ফলিয়ে বলে ওষুধ চাইলেন।অমিয়নাথ ধৈর্য সরে সব শুনে অন্য এক ঘরের ভেতরে ঢুকে নিজের একডোজ ওষুধতৈরি করে এনে বললেন, কাল সকালে খালি পেটে এটা খাবেন।

----তারপরে? আর কোনো ওষুধ দেবেন না ?

----না,ওইটুকুই যথেষ্ট।

----সেকিএতরকম রোগ, এত উপসর্গ, এতদিনের পুরোনো, একটা ডোজেই সেরে যাবে?

আঝ্বাসী সংশয়ী মানুষটিরদিকে সোজাসুজি তাকিয়ে অমিয়নাথ বললেন, মশায়ের কি বিবাহ হয়েছে ? আচ্ছা। সন্তান হয়েছে ?বেশ ! তা মশাইবলুন তো, ওই সন্তান হতেকতটুকু বীজ লেগেছিল ? যান, বাড়ি যান।

একই সঙ্গে এমন, তত্ত্বজ্ঞ, সারদর্শী ও রসিক ব্যত্তি আমি কখনও দেখিনি ।তাই তার জীবনের অন্ত্যপর্বে,অশীতিপর বয়সে, স্ত্রীবিয়োগের পর নির্জননিঃসঙ্গ মানুষটির কাছে মাঝে মাঝেযেতাম নানা রকম জিজ্ঞাসা নিয়ে।কখনও কখনও চাঙ্গা হয়ে উঠতেন ।একবার যেমনজানতে চেয়েছিলাম , সবাই বলেন রবীন্দ্রনাথের গানে নাকি কথা ও সুরের সমতাআছে--- কেউ কাউকে ছাপিয় যায় না। ব্যাপারটা কী বলবেন ? সংগীতের বাণী ও সুরের সমানুপাত কাকেবলে ?

খাড়া হয়ে বসে বললেন, ভালোসেটের কাপ ডিস দেখেছেন ? আচ্ছা দেখাচ্ছি । বলে একটা সাধারণ কাপ ডিস, যাটেবিলেই ছিল, তুলে নিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে কাপটা কানায় কানায়ভরলেন। তারপরে সেই জলটা ঢাললেন ডিসে---- উপচে পড়ে গেল। দেখলেনতো ? কনটেনার আর কনটেন্ডে মিললনা। আচ্ছা, এবার দেখাই ভালোসেটের কারসাজি বলে বাড়ির ভেতর থেকেআনলেন জাপানি সেটের স্বচ্ছ কাপডিস। জলে ভরলেন কাপেছাপাছাপি---তারপরে সেই জল ঢাললেন ডিসে। একবারে সমান সমান ।হা-হা করেহেসে বললেন, কী বুঝলেন ? এটা থেকেবুঝে নিন বাণী ও সুরের সমতা কাকেবলে। অতুলপ্রসাদ আর ডি.এল. রায়ের গানের সুর বাণীকে ছাপিয়ে যায়। রবিবাবুর গানে একেবারে সমান সমান।

আমি মুগ্ধচোখে তাকাতেই বললেন,উঁহু, কথা এখনও শেষ হয়নি। সমতাই তো শেষ কথা নয়, সুষমা চাই। যেমনকাপে যদি ফুল আঁকা থাকে তবে ডিসে হাতি আঁকলে হবে কি ? হবে না।আঁকতে হবে একটা প্রজাপতি।এবারে কাজটা সমাধা হল।

তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্বেরকথা ভাবলে মন বিষন্নতায় ভরে যায় ।এতি জ্ঞানি গুণী মানুষ, এত অনবদ্যঅনুভবী শিল্পী আমি তো অন্তত দেখিনি। ভালো সঙ্গসান্নিধ্য বন্ধু পাননিএমন যাঁকে ব্যত্ত করবেন মনের ভার ।স্ত্রীবিয়োগের পর আর নিজেকে সামলাতেপারলেন না। নিজে হাতে পুড়িয়ে দিলেন রাশি রাশি অপ্রকাশিতপান্ডুলিপি--- যার মধ্যে ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাভাষ্যসমেত অনুবাদ।এরপরে তাঁর মনের ভারসাম্য টলে যায়। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝেপথে ঘুরে বেড়াতেন।

তাঁর এইরকম মানসিক সংকটেরকালে একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা হল শহরের আদালত সংলগ্নপ্রশস্ত মাঠে। কোমরে সমস্যা হয়েছিল আশি পেরোনো বয়সে, একটু যেন ন্যুব্জভঙ্গি। পরনে ধুতি ও গেঞ্জি, কোমরে জড়িয়ে নিয়েছেন বিসদৃশভাবে একটানতুন লাল গামছা। আমার মুখোমুখি হতে মনে হল চিনতে পারলেন। কুশল জিজ্ঞাসাকরার আগেই আমার দিকে অনেকক্ষন নিরিখ করে বললেন, মশাই অমিয়সান্ডেলের বাড়িটা কোথায় বলতেপারেন ? আমার চোখে জল এসে গেল।

এতদিন পরে তাঁর ঐপ্রশ্ন ভারি দ্যোতনাময় হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর পুত্র কন্যারাকৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রিটের তে -মহলাবাড়ি বেচে চলে গেছেন। সেখানেএখন প্রমোটারের থাবার কেরামতিতে গড়ে উঠেছে মস্ত সুপারমার্কেট। অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের মতো বিখ্যাত ও উন্নত শহরে অমিয়নাথসান্যালের মতো বিরল ব্যক্তিত্বের কোনে চিহ্ন রইলনা। শহরবাসী উদাসীন, পুরসভা নিষ্ক্রিয় । তাঁরভদ্রাসনে এক পাথরের ফলকও নেই।

একদিন তাঁর মতোই হয়ত কেউ জিগ্যেস করবেঃ মশাই,অমিয় সাণ্ডেলের বাড়িটা কোথায় ছিল বলতে পারেন ?

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com